ঠাকুর বাবার মুখাস্মৃত বিভূতি

বাবার আদ্যমা

ভূমিকা

এই বইটির লেখিকা আমি স্বয়ং নিজে আদ্যাময়ী লাহা। শ্রী শ্রী গুরুমহারাজের দীক্ষিতা সন্তান এবং কোন্নগর আশ্রমের প্রিয় আদ্যাদি নামে সকলের কাছে পরিচিত। দীর্ঘ দিনের জীবনে আমি সংসারের দায় দায়িত্ব সুনিপন ভাবে দেখাশুনা করার পরেও বাকী সময়টুকু গুরুসেবার বন্দনা করার চেষ্টা করে গেছি নানা অসুবিধা মধ্যে থেকে ও গুরু সেবা থেকে কখনো ফিরে তাকাবার চেষ্টা করিনি। যতদিন গেছে ততোই গুরুদেবের সেবার প্রতি আরও বেশী ব্রতী হয়েছি। তাই শ্যাম বাজারে আমাদের বাড়ীতে গুরুবাবা তিনি তাঁর পুন্য পদধূলি কয়েক বার দিয়ে গেছেন। আজ ও আমি বর্তমানে গুরুদেবের টানে মাঝে মধ্যেই আশ্রমে তাঁর পূন্য চরণের পদধূলির জন্য হাজির হয়ে থাকি।

- প্রকাশক -

শ্রীমতী আদ্যাময়ী লাহা
২/১বি, নিলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০০০৪
দেশবন্ধু পার্কের নিকট
মোবাইল - ৯১ ৮৭৪৫৫৪১১৩৬

জয়গুরু

(১) আমার প্রথম দর্শন কিভাবে সেটাই বলছি। একদিন নাগ ডাক্তার ওনাকে অর্থাৎ (আমার স্বামীকে) বলেছিল দাদা একজন মহাপুরুষকে দেখতে যাবে। সেইমতো একদিন সময় করে নাগ ডাক্তার ওনাকে নিয়ে নির্মলেশ্বরদার বাড়িতে নিয়ে যান। এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। রাত্রি ১১টা বেজে গেছে, তবু উনি বাড়ী না ফেরায় ওনার ভাইকে এবং কাকাকে জিজ্ঞাসা করি যে কোন কাজে কোথাও গিয়াছে নাকি, ওনারা তখন কিছু বলতে পারল না। বললেন আমাদের কিছু বলে যায় নি। এইভাবে রাত যতো বাড়তে থাকে ততোই আমি চিন্তিত হতে লাগলাম। তারপর রাত্রি ২টার সময় যখন ফিরলেন আমি খুব রাগারাগি করতে লাগলাম। উনি তখন আমাকে বললেন যেখানে গিয়েছিলাম তোমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবো। রাগারাগি করো না। এরপর রবিবার এলো আমাকে নিয়ে হুগলীর আশ্রমে এলেন, গিয়ে দেখলাম তখন সবাই বসে আছেন বাবার ব্যাখা শুরু হবে বলে। আমি প্রথম দর্শনে কীরূপ দেখলাম লম্বা চওড়া এক মানুষ বসে আছেন আমি চোখ ফেরাতে পারছিনা। দূর থেকে ইশারা করে হাত নেড়ে আমায় ডাকলেন, আমাকে সবাই জায়গা করে দিলেন বাবার কাছে যাবার জন্য, আমি গেলাম নমস্কার করে বসলাম, বাবা আমায় বললেন আয় মা বোস। এই আমার প্রথম দর্শন এবং আশ্রমে আসা যাওয়া শুরু হলো।

(২) আমার স্বামী অনেকদিন থেকে একজন সাঁধু খুঁজছিলেন দীক্ষা নেওয়ার জন্য। সেইমতো অবশেষে পৌষ মাস এলো, আমাদের এখানে গঙ্গাসাগরের মেলায় ভিন্ন রাজ্য থেকে সাঁধু সন্ন্যাসীরা এসে থাকে। সেই সব সাঁধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে বহু সাঁধুই ওনার দোকানে পয়সা নিতে আসেন। আমার স্বামী বাবার একটি ছবি পকেটে সর্বদাই রেখে দিতেন। ঐ ছবি বার করে সাঁধুদের দেখালে ওনারা বলতেন

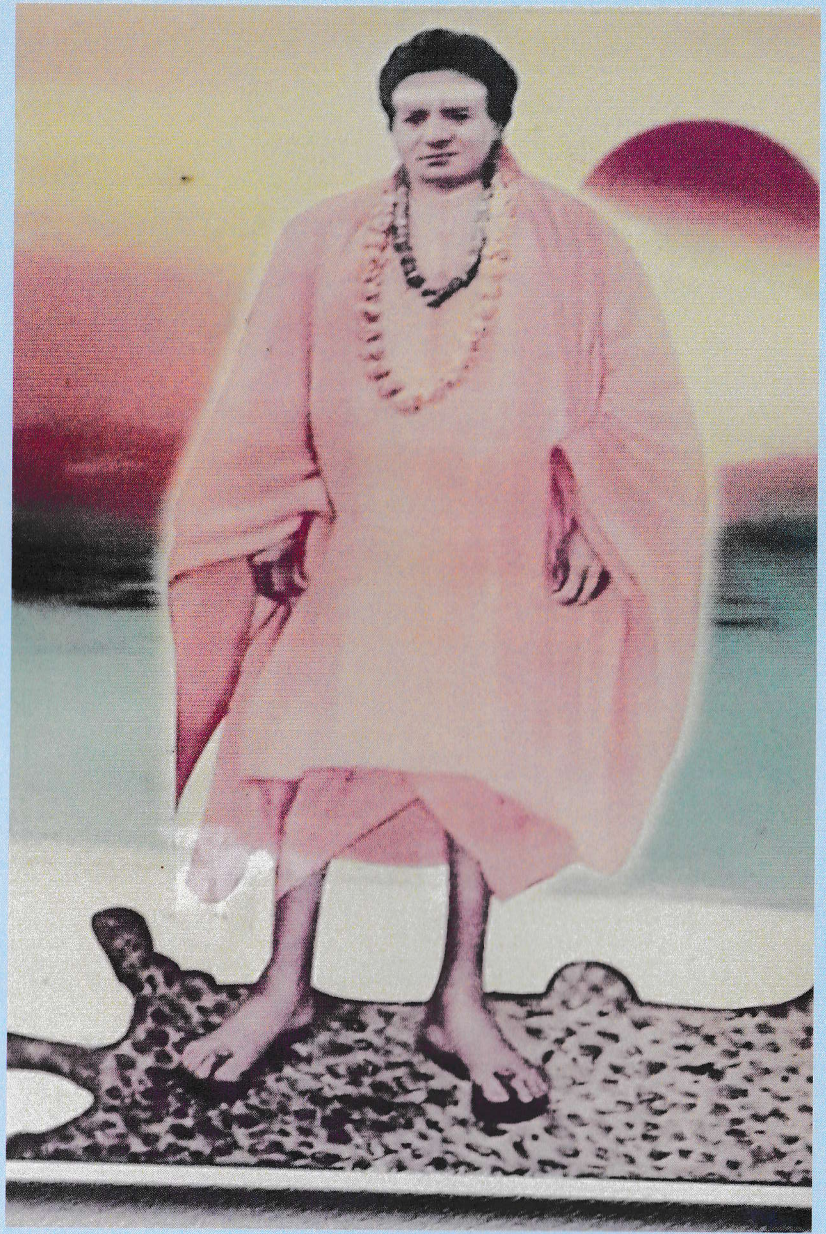

একে কোথায় পাবি, এ পাহাড়ে থাকে। এরকম ভাবে যত জনকে দেখিয়েছেন সবাই কপালে ঠেকিয়ে বলেছেন এর দেখা পাবি না উনি মর্ত্তে নাবেন না.

৩) এরপর একদিন অহিদাকে দিয়ে উনি বলিয়েছিলেন আমাদের দীক্ষা দেওয়ার জন্য। বাবা বলেছেন মনে আছে।

৪) আমরা তখন খুব তারাপীঠে যেতাম মাসে দুইবার একবার, একবার তারামার সামনে ছবিটা দেখিয়ে বলে ছিলেন মা ওনার কাছে আমরা দীক্ষা নেবো বলে মনে মনে ঠিক করেছি।

৫) তারাপীঠ থেকে ফেরার দুই দিন পরে বাড়ীতে ফোন যায় বাবা বলেছেন আমাদের কাটবেন মানে দীক্ষা দেবেন।

৬) বাবা এবার হুগলীর আশ্রম থেকে লক্ষ্ণৌয় যাবেন। বাবা ওনাকে বললেন, বাবা তোমার গাড়ীটা একবার দেবে আমায় হাওড়ায় পৌছে দেবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম ওতো আপনার গাড়ী বাবা, কেন দেবে না। তখন বাবা আমায় বললেন আয় চু খাই (চুমু)। এইবার যাবারদিন গাড়ী খারাপ হয়ে গেলো সারিয়ে নিয়ে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেলো বিকাল চারটেয় হুগলীর আশ্রমে পৌছোবার কথা আমরা বাড়ী থেকেই বেরোলাম বিকাল চারটেয়। আমি আর আমার মেজছেলেকে সঙ্গে নিয়েছি ও বড় দুষ্টু বাবার চরণে ঠেকিয়ে আনবো বলে। ড্রাইভারকে বললাম দেরী হয়েগেছে যত তাড়াতাড়ি পারো চলো যখন হুগলীতে পৌছালাম তখন সবাই বললেন বাবা এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে হাওড়া ষ্টেশন যেতে বললাম এবং যতো জোর পার গাড়ী চালাও গাড়ী খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে আমরা দুজনে এদিক ওদিক হচ্ছি। যখন হাওড়া ষ্টেশনে এলাম তখন দেখছি প্ল্যাট ফরমে গুরু ভাই

আর উনি সবাই ঘুরছে আর বলছে এইমাত্র গাড়ী ছেড়ে দিল চলো দেখি আছে কিনা এই বলতে আমি কোন রকমে গাড়ী থেকে নেমে ছুটছি আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে অহিদা নিয়ে যাচ্ছে। বাবার গাড়ী প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমাকে চাংদোলা করে বাবার গাড়ীতে তুলে দিল তারপর আমার জ্ঞান ছিলো না। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম আমি বাবার পায়ের কাছে পড়ে আছি। বাবা আমায় বললেন তুই তো মা ঠান্ডা হয়ে গেছিস। আয় তোকে গরম করে দিই। আমার হাত নিয়ে ঘসে ঘসে, আমাকে চেপে ধরে রেখেদিলেন। তারপর আমাকে বললেন যা মা এবার গাড়ী ছাড়বে। তুই খুব ভালো থাকবি বলে চুমু খেলেন। এরপর আমাকে নামিয়ে দিলেন গাড়ী ছেড়ে দিলো। এত দয়া আমার উপর আমি কি ভাগ্যবান।

৭) এরপর আমাদের দীক্ষা হয়ে গেলো এই দীক্ষা মজার ঘটনা. ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর বাড়িতে আমাদের দীক্ষা হয়েছিল। এই দীক্ষার সময় বাবা নিজে সব করেছেন। মূল মন্ত্র দেওয়া পুজোপাঠ সব করিয়েছেন। অহিদা বলেছিলেন বাবা ওরা একদিন হোমে বসবে। আজ আর হোম করতে হবে না, বাবা রেগে গিয়ে অহিদা কে খুব বকা দিলেন এবং বললেন হাঁড়ি করে আগুন নিয়ে আয় আমি হোম করবো। সেই গামলি করে আগুন জ্বেলে হোম হলো বাবা নিজে হোম করলেন আমাদের কে বসিয়ে। এরপর আমরা বাবাকে প্রণাম করে উঠে এলাম। অহিদা আমাদের বললেন তোমরা আজ থেকে আমাদের গুরুভাই ও বোন হলে।

কিন্তু তোমাদের দেখে আমাদের হিংসা হচ্ছে, কেননা বাবা এইভাবে কাউকে দীক্ষা দেন নি। বাবা শুধু মূল মন্ত্রটা কানে দেয়। আর সবকিছু আচার্য করেন তোমরা এক ভাগ্য করে এসেছিলে।

৮) একবার লক্ষ্মৌতে বাবা ডেকে পাঠালেন, আমরা গিয়েছিলাম চাঁদসীদার

বাড়িতে থাকতাম বাবা বটোদা (গুপিনি মার বাড়িতে থাকতেন) সেইখানে ব্যাখ্যা হতো তারপর খেয়ে দেয়ে যে যেখানে থাকে চলে যেতো। একদিন ব্যাখা শেষে খাওয়ার জায়গা হয়েছে যে যে খেতে বসেছেতার মধ্যে বড়মা বাবাকে খাওয়াচ্ছেন। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে মনে বলছি ঠাকুর তোমায় যদি আমি খাওয়াতে পারতাম। অন্তরযামী প্রভু ঠিক মনের কথা শুনতে পেয়েছেন। ঠিক তারপরের দিন খাওয়া দাওয়ার জায়গা হয়েছে আমাকে কে একজন বললো আদ্যাদি বাবা আপনাকে ডাকছেন। আমি এঘরে বসে গল্প করছি তাড়াতাড়ি উঠে হাত ধোয়া নেই বাবার কাছে গেছি। বাবা বললেন আয়মা আমাকে খাওয়া এবং বড়মাকে বললেন তুই খেতে বোস। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়ে বড়মাকে চেপে ধরেছি বড়মা বললো বাবা তোকে বলে দেবে তোর ভয় নেই। সেই আমার বাবাকে খাওয়ানোর হাতে খড়ি।

এইবার সব গুরুভাইদের খাওয়া হয়েগেছে বাবা বললেন কেউ উঠবে না। আমাকে বললেন যা খেতে বোস। সবাই-এর খাওয়া হয়েগেছে শুধু বাবা আমার জন্য বসিয়ে রেখেছে ওনাদের, আমার কী লজ্জা করছে কী বলবো।

৯) একবার পুরীতে সঙ্গ করতে গেছি। বাবা এক বাড়িতে থাকতো, আমরা অন্য বাড়ীতে থাকতাম. সকালবেলায় উঠে স্নান সেরে বাবার কাছে যাবো বলে তৈরী হতাম। পুরীতে অনেক ফুল পেতাম করবী, আকুন্দ সেই ফুল তুলে মালা গেঁথে নিয়ে যেতাম। আমি বাড়ী থেকে ছুঁচ, সুতো, গঙ্গাজল শিশি করে নিয়ে যেতাম সঙ্গে একটা ছোট রেকাবী। এইভাবে রোজ মালা করে নিয়ে যেতাম যেদিন মালা বড় হতো গুরুদেবের গলায় পরাতাম ও যেদিন ছোট মালা হতো তা চরণে দিতাম। যে বাড়ীতে থাকতাম সেখান থেকে চন্দন ঘষে নিয়ে যেতাম। ওখানে গিয়ে বাবার চরণ ধুইয়ে শাড়ী আঁচল দিয়ে মুছিয়ে চন্দন দিয়ে চরণে ওঁকারএঁকে মালাটা দিতাম এবং

নমস্কার করে চরণামৃত খেতাম। এই রকম রোজ করতাম। একদিন বাবা সকলের সামনে বলছেন দেখো দেখো কালকের শিশু।

১০) কোন্নগর আশ্রম তৈরী হচ্ছে, বাবা হুগলী থেকে দেখতে এসেছেন, সন্ধ্যা বেলায় বাবার ঘরের বারান্দায় গঙ্গার ধারে বসে আছেন। আমরা কয়েকজন ছিলাম কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখি বাবা হাততালি দিয়ে যা যা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা সবাই ছিলাম এবং সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করি বাবা কী হয়েছে, বাবা বললেন ঐ যে দেখনা চলে গেল, আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না।

১১) ঐ কোন্নগর আশ্রমের জন্য বাবা উজ্জয়িনী থেকে শিবলিঙ্গ কিনে চাঁদসীদের বাড়ীতে রেখে গেছেন। আর বলেগেছেন আমাদের খবর দিতে আমরা যেন গাড়ী করে গিয়ে মুর্ত্তিটি নিয়ে আসি। আমরা মানে আমি উনি নাগডাক্তার ও আমার দাদা এই চার জনে মিলে গেলাম। চাঁদসীদার বাড়ীতে থেকে কদিন বেশ হৈহুল্লোড় করে ফিরে আসার দিন ঠিক হলো। আমরা খাওয়া দাওয়া করে গাড়ীতে বসলাম। চাঁদসীদা আমাকে বললেন দিদি ভাই তুমি শিবের লিঙ্গটা কোলে নিয়ে বসো। আমি অশুচী ছিলাম বলে, বললাম না না উনি গাড়ীর পিছনে ঠিক যাবেন । তাই ঠিক হলো। আমার দাদা গাড়ী চালাবেন বলে গাড়ীতে বসে ষ্টার্ট দিতে গেলো কিন্তু গাড়ী কিছুতেই ষ্টার্ট হলো না। কী ব্যাপার গাড়ীতো ঠিক আছে কেন বন্ধ হলো। তখন সবাই বললো জয়গুরু বলা হয়নি, জয়গুরু বলো তৎক্ষনাৎ সবাই মিলে জয়গুরু বলা হলো তাতেও হলো না। চাঁদসীদা তখন বললেন বোনকে বললাম কোলে করে নিয়ে যাও শুনলে না এইবার হলোতো, তখন সেই মূর্ত্তি পিছন থেকে বার করে আমার পাশে রাখি এবং লিঙ্গটা কোলে নিয়ে বসি। তারপর যাই গাড়ীর চাবিটা ঘোরালে ওমনি গাড়ী ষ্টার্ট হয়ে গেলো এবং গাড়ী চলতে লাগলো।

১২) আমার দাদা কিছুদূর যাবার পর বললো কানপুরে কী একটা দেখার আছে ওটা না দেখে যাবো না। উনি বললেন না সোজা বাড়ী ফিরে চলুন। আমার ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। দাদা গোঁ ধরলো আমি না দেখে যাবো না। দেখি আমায় কে নিয়ে যায়। উনি বললেন আপনার হাতে গাড়ী আপনি যা করবেন। এই বলে গাড়ীতো বেশ যাচ্ছে মাইল দশেক যাবার পর গাড়ীর কি যেন একটা দোষ দেখা দিলো। আরো কিছুদূর যাবার পর গাড়ী আর চললোনা। ওখান থেকে কোন রকমে আবার গাড়ী নিয়ে চাঁদসীদার বাড়ীতে ফিরে এলাম. পরের দিন গাড়ী সারিয়ে সোজা আমরা কোলকাতা রওনা হলাম এবং অবশেষে কোলকাতা পৌছালাম, কোন্নগর আশ্রমে মূর্ত্তি রেখে আবার যখন গাড়ীতে উঠছি বাড়ী আসবো বলে তখন মনে হলো যেন গাড়ী কতো হাল্কা হয়েগেছে।

১৩) আশ্রমে নাগেশ্বর প্রতিষ্ঠার দিন আমি একটি ছোট শিবলিঙ্গ নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবা দেখে বললেন বা, মা বেশ করেছিস মন্দিরে রেখে আয় আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেবো। আমি তখন হাওড়ায় থাকি তখন হাওড়ায় ট্যাক্সি যেতে চায় না, তার উপর সেদিন আবার বৃষ্টি হয়েছে একেবারেই যাবে না। এদিকে আশ্রমের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরবো খুব চিন্তা হচ্ছে ঠাকুর নিয়ে আমি কী করে যাবো, বাবাকে প্রণাম করতে গেলাম বাবা বললেন যা মা সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা কোন্নগর থেকে ট্রেনে করে হাওড়া ষ্টেশনে এলাম। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডে এলাম এসে দেখি একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আর মনে হলো যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই আসন বাবু বলে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলাম এবং কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করলো। আমাদের বাড়ীর কাছে নামিয়ে দিল এবং যা ভাড়া, তাই নিলো। অন্যদিন যা ভাড়া তার বেশী দিতে চাইলেও যেতে চায়না। বাবার এতো দয়া আমার উপর।

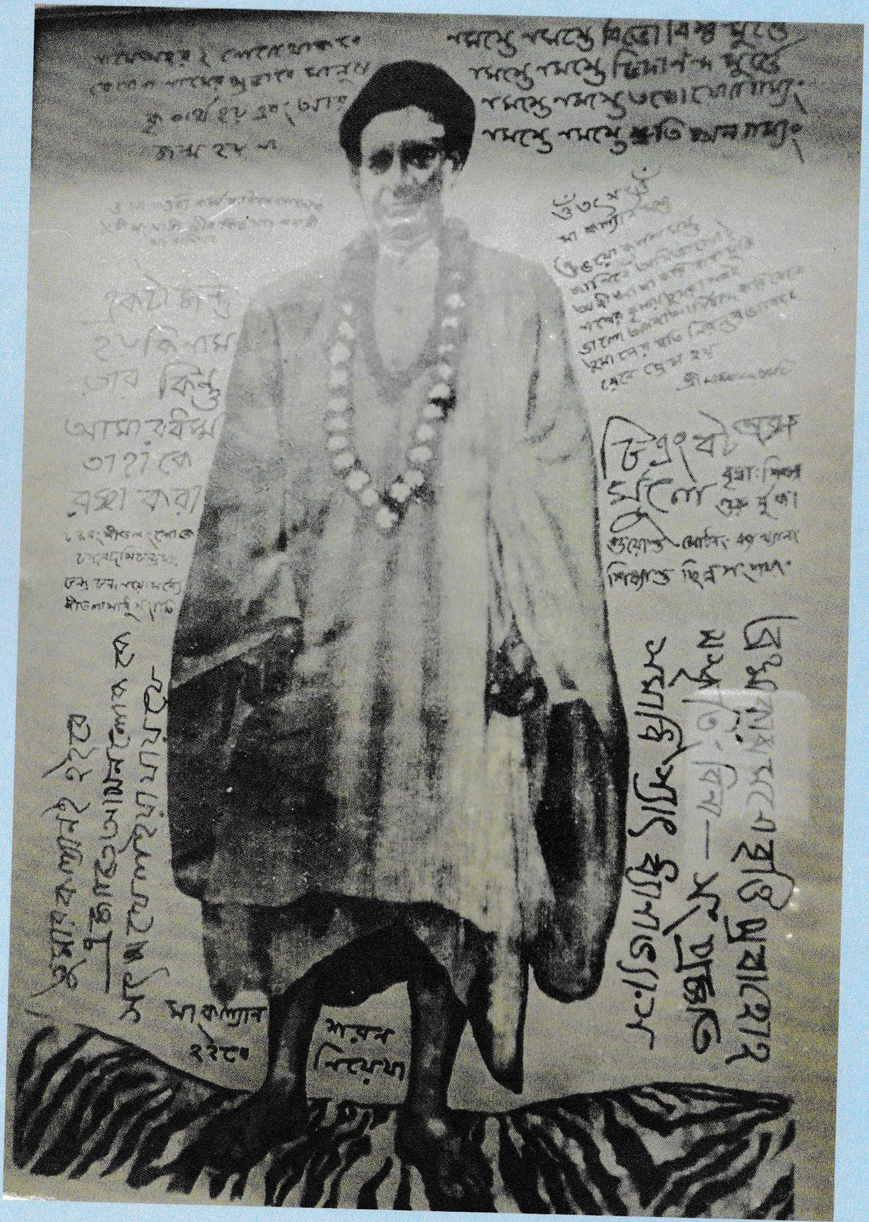

১৪) ১৯৭০ সালে নকশাল আমলে একদিন একটি আমাদের হাওড়ার বাড়ীতে ওনার নামে চিঠি আসে চিঠিটা আমিই প্রথম খুলি এবং পড়ি, তাতে লেখা আছে এত হাজার টাকা না দিলে ভুঁড়ি এক জায়গায় ও ধড় এক জায়গায় করে ফেলবো। বাড়ীতে আমি তখন একা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি ওনাকে ঘরে চাবি দিয়ে নীচে কাজ করছি। উনি কেবল বাবাকে ডাকছেন। বাবা অন্তরযামী জানতে পেরে সবাইকে বলেছেন আগে তৃষির কোথায় বল। বাবা ওনাকে তৃষি বলে ডাকতেন। খবর না পেলে আমি নাগেশ্বর এর মূর্ত্তি তুলে ফেলে দেবো। তারপর বললেন আরতি কর, যারা আশ্রমে ছিলো তারা বললেন আরতি হয়েগেছে বাবা, বাবা বললেন আবার কর বলে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন আমাকে কেউ বিরক্ত করবি না। বাবা এসে ওনার সঙ্গে দেখা করে গেছেন বলেছেন তোর কোন ভয় নেই। আশ্রমে গীতার শ্লোক পড়িয়েছেন। এইসব কথা আমার গুরু ভাইদের মুখে সব শোনা।

১৫) এরপর আমি ১৯৭১ সালে হাওড়া ছেড়ে স্থায়ী ভাবে শ্যামবাজারে চলে আসি। তারপর আমাদের শ্যামবাজারে আসার বেশ কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন বাবা আমার শ্যামবাজারের বাড়ীতে আসেন এবং আমার বাড়ীর তিন তলার ঠাকুর ঘরে পা রেখেছিলেন। এরপরেও অনেকবার আমার বাড়ীর কাছে এসেছে দুখানা গাড়ী করে গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন। গুরুভাইরা এসে আমায় ডেকে বললেন বাবা এসেছে। আমি তৎক্ষনাৎ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে যেতাম নিচয় গাড়ীর কাছে। তখন শাড়ী পর্যন্ত পাল্টাবার সময় ছিল না। আগে গিয়ে বাবার চরণের কাছে বসে পড়তাম, বাবা বলতেন আয় মা চু খাই কত আদর করতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন, আমি বলতাম বাবা আমি উপরে যাই এবং দাদাদের জন্য চা করে আনি

বললাম ইভাদি থাকুক আপনার কাছে, আমি নীচে কারোর ঘরে থাকবো বাবা বললেন তাই হবে। তারপর আমরা গঙ্গার ধারে বসে গল্প করছি। ইভাদি বাবার কাছে থাক বলে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে বাবা খুব চেঁচামেচি করছেন, তখন সুভাষদা আমাকে ডাকলেন, আদ্যাদি তাড়াতাড়ি আসুন বাবা আপনাকে ডাকছেন। আমি ভয়ে হাত পা না ধুয়ে বাবার ঘরে চলে গেছি। বাবা আমাকে দেখে বললেন মা এসেছিস, শালীকে তাড়িয়ে দিয়েছি, ফাকড়ী, মাকড়ি, আমি মুখে কোন কথা না বলে শুয়ে পড়েছি।

১৮) আশ্রমে বাবার কাছে যখন থাকতাম, বাবা সকালে চা খাওয়ার পর বেড়াতে যেতেন গাড়ী করে বিবেকানন্দ সেতুতে আবার ওখান থেকে ঘুরে চলে আসতেন। একদিন মাঝামাঝি আসার পর বাবা আমাকে বলছেন মা তোকে গঙ্গায় ফেলে দিই। আমি তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করে বললাম বাবা আপনার যা ইচ্ছা, তখন বাবা শক্তিদাকে বলছেন কীরে শক্তি কুমার মাকে ফেলে দিই। শক্তি দা বললেন বাবা আপনি যখন মনে করেছেন তখন দেবেনই, বাবা হাসতে হাসতে আমাকে বললেন জরিমানা দে, গঙ্গায় চার আনা পয়সা দে, আমি বাবাকে প্রণাম করে গঙ্গায় পয়সা দিলাম। বাবা আমাকে বললেন আয় চু-খাই, চুমু খেলেন কত আশীর্বাদ করলেন, তাই আজও আমি এই সেতু পার করার সময় এক টাকা করে ফেলে যাই।

১৯) এরকম একদিন আশ্রমে আছি, একদিন বাবা বললেন মারে, আজ আর বাবা তোকে ছেড়ে যাবে না, সেদিন ছিলো রবিবার তিন ছেলেকে নিয়ে যেতেন, আজ দাদারা ও তোকে ছেড়ে যাবে না। এ রকম বলায় আমি ওনাকে বলে দিয়ে গেলাম বাবা যদি বলে মাকে নিয়ে যাবি। তুমি বলবে না বাবা আপনার মেয়ে আপনার কাছে থাক বলবে। এবার ওনারা যখন বাবাকে প্রণাম করে বসেছেন, তখন বাবা বলছেন কীরে বাবা মাকে নিয়ে যাবি, উনি বললেন না বাবা আপনার মেয়ে আপনার কাছেই থাক।

বাবা যখন বলছেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্তরযামী প্রভু সবই জানেন।

২০) একবার আশ্রমে অনেক লোকজন এসেছে বাবা রেগে গিয়ে খুব গালাগাল করছেন ধূলো, মূলো, ছাই যতো সব এখানে এসেছে এরকম ভাবে এক নাগাড়ে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন। আমি উঠে নীচেয় এলাম অজুদাকে বললাম বাবা ভীষণ রেগে গেছে, আমি কদিন তো আছি বাড়ী চলে যাই। আমি বাবাকে প্রণাম করে চলে এলাম আমার বাপের বাড়ীতে, ওখানে এসে ফোন করে দিলাম গাড়ী পাঠিয়ে দেবে বলে। আমি সবেমাত্র বাড়ীতে এসেছি। বন্ধু গিয়ে হাজির আমি বললাম কীরে এখন এলি। বন্ধু বললো বাবা তোমায় নিয়ে যেতে বললো। কী করবো তখন আবার সেই গাড়ী করে আশ্রমে এলাম। বাবার কাছে যেতেই বাবা চুমু খেয়ে বললেন মা তুই চলে গেছিস, আমি কি তোকে কিছু বলেছি। আমি বললাম না বাবা সেই জন্য নয় আমি তো কদিন আছি ওরা এসেছে থাকবে বলে তাই আমি চেলে গেছি।

২১) আশ্রমে যখন থাকতাম বাড়ীর কথা, বা ছেলে মেয়েদের কথা কোন চিন্তাই করতাম না, কেবল বাবাকে যখন প্রনাম করতাম, বাবা বলতেন সব ভালো আছে মা।

২২) একবার মুকুলদার সঙ্গে কী হয়েছিল জানি না। মুকুল দা বাবাকে বলেছে বাবা আপনার ভান্ডার শূন্য হয়েগেছে। সেই শুনে বাবা আর ব্যাখায় বসতেন না। উঠতেন না দিনরাত খালি গালাগাল করতেন। এরকম একদিন বাবা রাগারাগি করছেন, উনি সেই সময় বললেন কে বলেছে বাবা আপনার ভান্ডার শূন্য হয়ে গেছে। আপনার ভান্ডার তো পরিপূর্ণ, আপনার ভান্ডার কোনদিন শূন্য হতে পারে না, আপনার

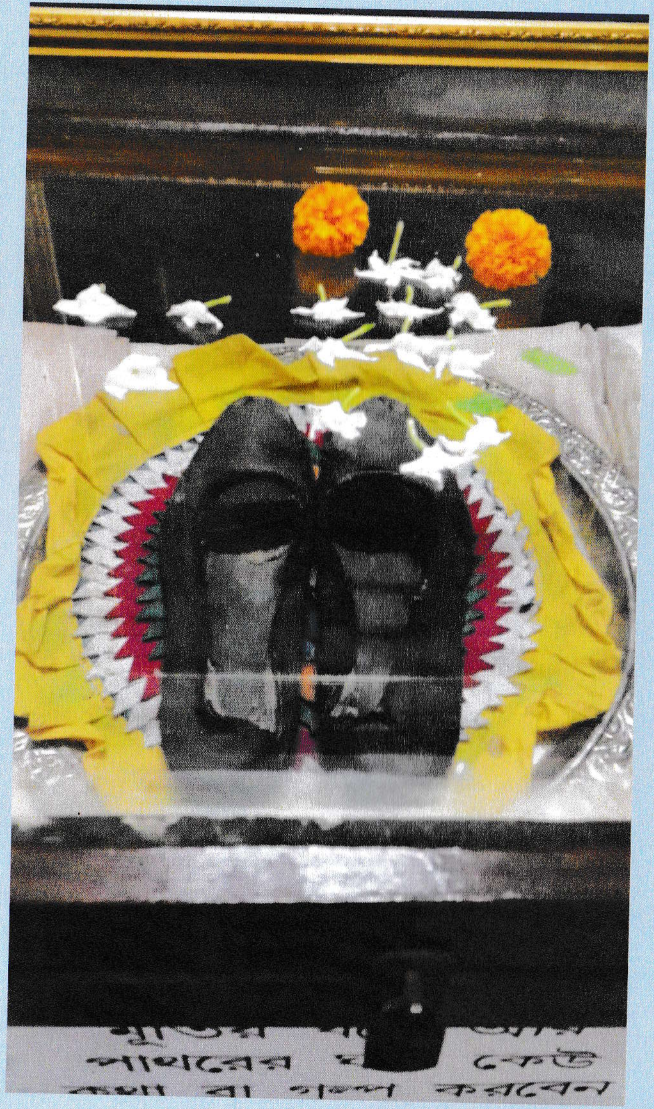

ছেলেরা তো রাজার ছেলে, সেই রাজার কী ভান্ডার শূন্য হতে পারে। তখন বাবা বললেন হ্যাঁ তুই বলছিস তৃষি। তখন বাবা আবার উঠলেন ব্যাখায় বসলেন খাওয়া দাওয়া করলেন।

২৩) আবার একদিন মুকুলদার সঙ্গে কী হলো আশ্রমের দলিল নিয়ে সই করার কথা নিয়ে রাগারাগি হয়েছে । উনি আমাকে বাবার কাছে থাকতে দিলেন না। আমাকে আর পাঠালেন না, বাবা বলেছেন একটা মা পেয়েছিলাম তাও হারালাম। এটা আমার গুরু ভাই ও বোনদের কাছ থেকে শোনা। তখন উনি যখন বাবার সাথে দেখা করতে যেতেন, তখন বাবা মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকতেন। একটা কথাও বলতেন না। যখন চলে আসবে বলে বাবাকে ডাকতেন বাবা আসছি, তখন বলতেন কিছু খেয়েছিস বাবা।

২৪) কদিন পরে একদিন সকালে উনি বললেন বাবাকে একবার দেখে আসি মনটা কী রকম করছে। উনি গিয়ে দেখলেন বাবা লক্ষ্ণৌয় চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। উনি বাবার সঙ্গে দেখা না করে সোজা বাড়ীতে চলে এসেছেন এবং আমাকে বললেন বাবা লক্ষ্ণৌয় চলে যাবার জন্য তৈরী তুমি তাড়াতাড়ি চলো। আমি শুনেই কোন রকমে দু-একটা জামা কাপড় নিয়ে চলে গেলাম। মুকুলদা বাবাকে রওনা করার জন্য বারবার বলছিলেন। তখন বাবা বললেন আমার যাবার সময় হলে ঠিক যাবো আমাকে বলতে হবে না। যখন আমার গাড়ী আশ্রমের কাছে গেলো তখন বাবা বলছেন আমায় নামা। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবার পায়ের কাছে পড়লাম। খুব কাঁদছি আর বলছি বাবা আমি তো আপনার কাছে থাকবো বলে এসেছি, কোথায় যাবেন বাবা, বাবা আমাকে কতো আশীর্বাদ করলেন চুমু খেলেন আমাকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন মা তুই কিছু মনে করিস না আমি রওনা করে ফেলেছি আর হয় না। আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম। আবার কবে আসবেন বাবা এই কথা বারবার বলছিলাম, বাবাও কাঁদু

কাঁদু করে আমাকে বললেন মারে তোর কোন কষ্ট হবে না। তুই খুব সুখে থাকবি আর তোরা নিতে গেলে আমি আসবো শেষে বললেন একটু জল খাবো, অজুদা তাড়াতাড়ি জল এনে বাবাকে খাওয়াতে গেলে বাবা রেগে বললেন মাকে দেমা খাওয়াবে। আমি অজুদার হাত থেকে গেলাস নিয়ে বাবাকে জল খাওয়ালাম। বাবা কতো আশীর্বাদ করে চুমু খেয়ে বললেন যারে যা খুব সুখে থাকবি কোন কষ্ট হবে না। এই আমার শেষ পাওয়া সাক্ষাৎ বাবার কাছ থেকে।

২৫) বাবার কাছে যখন থাকতাম তখন বাবার শরীর খারাপ হলে বাবা রাঘোয়া রাঘোয়া করে খুব চেঁচাতেন আমি বুঝতে পারতাম না কী বলছেন। এরকম একদিন বাবা ডাকছেন রাঘোয়া বলে তখন আমি বললাম বাবা আপনি তো কতো কিছু করতে পারেন করে দেন না কেন। আমাকে বাবা তিনটি আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন তা আর হয় না মা, তার মানে তিনবার কায়াকল্প করেছেন উনি।

২৬) লক্ষ্মৌয় যখন বাবা দেহ রাখলেন, আমাদের এখানে ট্রাংকল এলো বাবা খুব অসুস্থ, আমরা গাড়ী নিয়ে রওনা হলাম। সারারাত গাড়ী চালালো আমার দাদা, ঠিক যে সময় বাবা দেহ ছেড়েছেন সেই সময় আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। দাদা কিছুই বুঝতে পারল না, গাড়ী চলতে চলতে কেন গাড়ী থেমে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর চলতে আরম্ভ করলো এইতো গেলো প্রথম পর্ব্ব।

২৭) আমরা গাড়ীতে বলা কওয়া করছি, প্রথমে বাবাকে দেখে এসে একটা হোটেলে ঘর ঠিক করে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে তারপর আবার বাবার কাছে যাবো। এইবারে কোন গুরুভাই ও বোনেদের বাড়ীতে উঠবো না বলে ঠিক করেছিলাম বটোদাদের বাড়ীর কাছে গলিতে এসে বারবার রাস্তা ভুল হচ্ছে।কিছুতেই সঠিক রাস্তায় পৌছাতে পারছিনা আমি বললাম এর আগে তো দুই তিনবার এসেছি রাস্তা ভুল হয়নি। এবারে কি হলো যে তুমি চিনতে পারছো না। শেষে এক ভদ্রলোক

যাচ্ছিলেন ওনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন চলুন আমি তো ঐ দিকেই যাবো। আপনাদের দেখিয়ে দেবো। উনি আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। বোটদাদের বাড়ীর কাছে এসে দেখলাম বাবার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের গাড়ী যেতেই নেপালদা ছুটে এলেন এবং মর্ম্মান্তিক কথা শুনালেন যে, বাবা আর দেহে নেই। এই কথা শোনা মাত্র আমার যে অবস্থা সে ভাষা বলা যায় না এবং আমরা কেউই আর সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করলাম না। আর উনি কে তা আমরা জানতে ও পারলাম না।

কাঁদতে কাঁদতে উপরে গিয়ে দেখি বাবা বরফের সিংহাসনে বসে আছেন যেন, আমরা যাবো বলে অপেক্ষা করছেন, বরফ গলে গলে ঘরের চারদিকে জল, আমি সেই জলের উপর বাবার পায়ের কাছে বসে পড়লাম। পৌষ মাস তারপর লক্ষ্ণৌয় এর মতো জায়গায় শীত ভীষণ তবুও আমি তখন একটুও ঠান্ডা বুঝতে পারছি না।

২৮) এদিকে বাবার দেহ কাহারাবলে একটা জায়গায় আছে। সেখানে চালা বাবারা থাকে। সেখানে বাবার দেহ মাটি দেবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। উনি বললেন যে, বাবাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। তখন ওখানকার কিছু লোক রাজি ও কিছু লোক রাজী নয়।বিশেষ করে এখানকার সুভাষদা, ও অজুদা। এই নিয়ে সারা রাত্রি কথা কাটাকাটি ও খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। তখন আমি বললাম, ওনাকে এবং আমার দাদাকে আমরা বাবাকে হারালাম। আর কথা কাটাকাটি ভাল লাগছে না। তুমি ছেড়ে দাও ওনারা যা ভালো বোঝে সেটাই করুক। তারপর অনেক বচসার পর উনি বললেন লাষ্ট আমার কথা বলছি। বাবাকে একটি ট্রাকে তোলা হবে এবং বাবার যেখানে যেখানে আশ্রম আছে সেই সব জায়গায় বাবার দেহ ঘোরানো হবে। যেখানে গাড়ীর ব্রেক ডাউন হবে, সেখানে বাবাকে রাখা হবে। এতে যা তেলের খরচ হবে তা আমি দেবো।

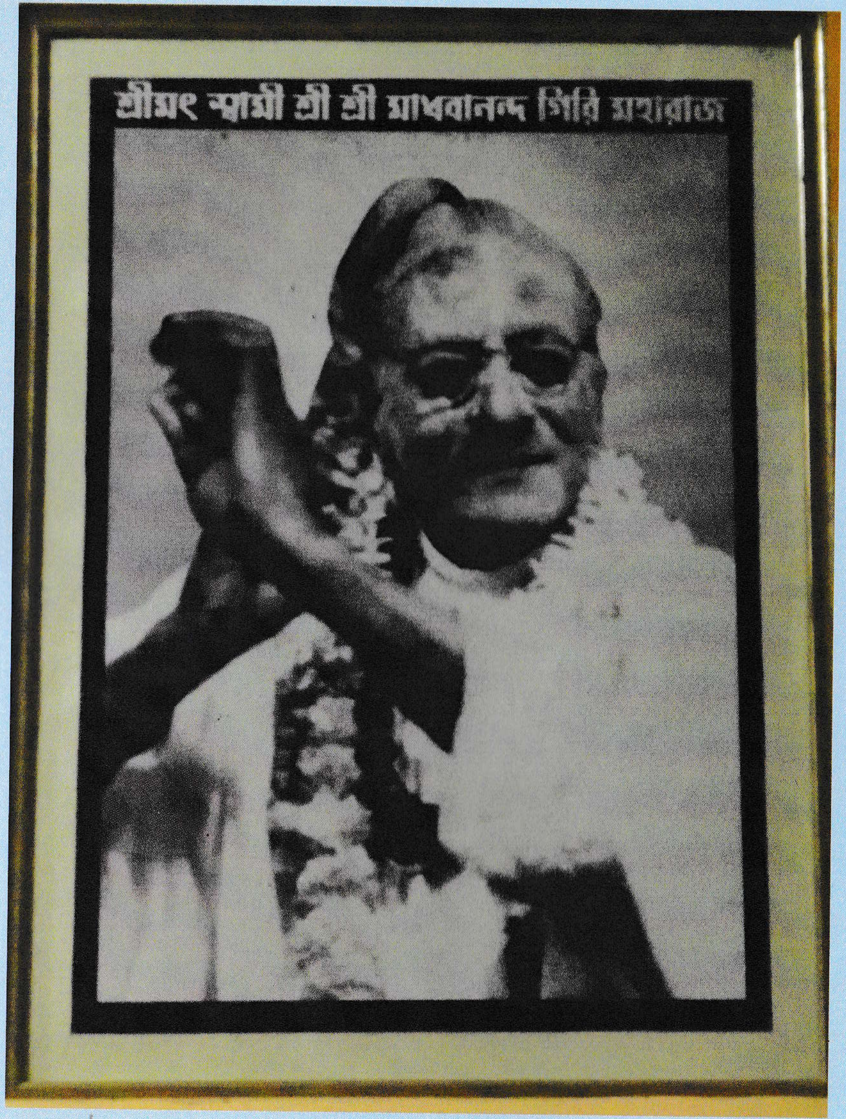

এই কথা বলতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল, কেউ আর মুখে কোন কথা বলল না। পরে আবার সেই গুঞ্জন তখন উনি আর কিছু বলেননি। আমরা চাঁদসীদার বাড়ীতে এসে চান টান করে চলে আসবো বলে তৈরী হয়েছি। উনি গেছেন বাজারে ফুলের মালা, ধূপ ও মিষ্টি কিনতে। এমন সময় বটোদার বাড়ী থেকে কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে ওনার নাম ধরে ডাকছেন। আমি বললাম উনি বাজারে গেছেন মালা আনতে, আমরা এখুনি কোলকাতা রওনা হবো। তখন বললো কাহারা থেকে লোক ফিরে এসেছে, চালাবাবারা বাবাকে ওখানে নিয়ে যেতে দেবে না। তুষ্টু দাকে সবাই ডাকছেন, বলছেন তুষ্টুদার সঙ্গেই বাবা কোলকাতায় যাবেন। এইবার আমরা বাবাকে নিয়ে কোলকাতায় রওনা হলাম, বাবা বলেছিলেন তোরা নিতে গেলে আসবো। সেই আমাদের সঙ্গে এলেন।

২৯) যে বছর বাবা দেহ ছাড়লেন ঠিক তার পরের বছর ২৬শে জানুয়ারী সকালবেলায় আমি পূজো হোম এবং বাবাকে লুচি, তরকারী করে ভোগ দিয়েছি এবং বাবার ছবিতে ভোগ নিবেদন করার সময় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এবং অনেক কান্নার পর তবে বাবাকে ভোগ নিবেদন করেছি। আর কেবলই নিজের মনে মনে বলছি ঠাকুর দেহে যখন ছিলে কত আনন্দের সঙ্গে তোমায় ভোগ নিবেদন করেছি। আজ আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে যে, তুমি অন্তরযামী বুঝতে পারছো।

এই কথা বলতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল, কেউ আর মুখে কোন কথা বলল না। পরে আবার সেই গুঞ্জন তখন উনি আর কিছু বলেননি। আমরা চাঁদসীদার বাড়ীতে এসে চান টান করে চলে আসবো বলে তৈরী হয়েছি। উনি গেছেন বাজারে ফুলের মালা, ধূপ ও মিষ্টি কিনতে। এমন সময় বটোদার বাড়ী থেকে কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে ওনার নাম ধরে ডাকছেন। আমি বললাম উনি বাজারে গেছেন মালা আনতে, আমরা এখুনি কোলকাতা রওনা হবো। তখন বললো কাহারা থেকে লোক ফিরে এসেছে, চালাবাবারা বাবাকে ওখানে নিয়ে যেতে দেবে না। তুষ্টু দাকে সবাই ডাকছেন, বলছেন তুষ্টুদার সঙ্গেই বাবা কোলকাতায় যাবেন। এইবার আমরা বাবাকে নিয়ে কোলকাতায় রওনা হলাম, বাবা বলেছিলেন তোরা নিতে গেলে আসবো। সেই আমাদের সঙ্গে এলেন।

২৯) যে বছর বাবা দেহ ছাড়লেন ঠিক তার পরের বছর ২৬শে জানুয়ারী সকালবেলায় আমি পূজো হোম এবং বাবাকে লুচি, তরকারী করে ভোগ দিয়েছি এবং বাবার ছবিতে ভোগ নিবেদন করার সময় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এবং অনেক কান্নার পর তবে বাবাকে ভোগ নিবেদন করেছি। আর কেবলই নিজের মনে মনে বলছি ঠাকুর দেহে যখন ছিলে কত আনন্দের সঙ্গে তোমায় ভোগ নিবেদন করেছি। আজ আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে যে, তুমি অন্তরযামী বুঝতে পারছো।

৩০) এই কান্না এবং বলা আমার সফল হলো ঠিক পরের দিন সকাল ৯টা হবে উনি ছাদে বসে দাড়ি সেফ করছেন এমন সময় আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছেন আমি দরজা খুলে দেখি একজন সন্ন্যাসী তার পিছনে ও একজন সে ছোট। আমি ওনাকে দেখে কোন কথা বলতে পারলাম না। নমস্কার করতে ভুলে গেলাম। ঐ সন্ন্যাসী এতো কাঁপছেন আর বলছেন মা বাবাকে ডাক। আমি যেন বাবাকে দেখছি। আর বাবার কথা শুনছি। পরে উনি এলেন এবং কেবলই বলছেন আমাকে চিনতে পারছিস না বেটা ঘরে এনে বসানো হলো কত কথা হলো। কতো আদর করলেন। তখন ছিলো সোমবার মিষ্টির দোকান বন্ধ কী করি বাতাসা আনতে দিলাম বাতাসা বাবাকে দিলাম। সেই প্রসাদ সবাইকে দিয়ে আমাকে বললেন মা ধর আমিও নিলাম পরে উনি একটা গ্রহণ করলেন। ঐ ঘরে ঠাকুর বাবার একটা ছবি ছিল। আমি ঐ ছবি দেখিয়ে কতবার বললাম উনি আমাদের গুরুদেব। একবার ও তাকালেন না। যাবার সময় বললেন বাবা আমায় বৃন্দাবন যাবার টিকিট করে দে। উনি কত টাকা জিজ্ঞেস করে টাকা দিলেন। পরে শুনেছি আমাদের গুরুভাই শক্তিদার মুখে বাবা নাকি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে ভান্ডার। দিয়েছেন আমাদের নামে। সেখানে আমাদের কোন গুরুভাই উপস্থিত ছিলো।